

Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় মধ্যযুগের গীতিকবিতা প্রসঙ্গ

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.3
Pages	53-71
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.3
প্রবন্ধ জমাদান: ২৪ এপ্রিল ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ৫৩-৭১

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় মধ্যযুগের গীতিকবিতা প্রসঙ্গ

মুনিরা সুলতানা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: munira.rrr@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সৃষ্টি। সুগভীর রসানুভূতি, সুনিবিড় ভাবসম্পদ এবং অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিতে বৈষ্ণবীয় কবিতাগুলো সমৃদ্ধ। বাংলা সমালোচনার পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই মধ্যযুগের গীতিকবিতা তথা বৈষ্ণব পদাবলির মূল্যায়ন করেছেন। বাংলা সমালোচনার সূচনালগ্নে তাঁদের মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক বিচার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে পদাবলি সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় তা প্রভাবসঞ্চারী ভূমিকা রেখেছে। সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টি ও বর্ণনভঙ্গিতে এই দুই সাহিত্যিকের অবস্থান স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব পদাবলি পর্যবেক্ষণে তাঁদের কৃতি বিশ্লেষণই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মূলশব্দ

বৈষ্ণব পদাবলি, ইতিহাসবাদী সমালোচনা, সাহিত্যিক নৃতত্ত্ব, গীতিকাব্য, বৈষ্ণবীয় প্রেম-বিরহবোধ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাবের গভীরতা, আন্তরিকতা, মন্ময়তা ও মর্মস্পর্শিতার বৈশিষ্ট্যে মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব কবিতা অনবদ্য। কল্পনার সুউচ্চ মহিমায় বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ-লীলার ভাবটি রঙ্গে ও রসে মণ্ডিত করে তুলেছেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্পর্কে কোনো ধর্মবিশ্বাস প্রাক-চৈতন্য যুগে না থাকলেও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি কিংবা জয়দেবের সাহিত্যকৃতি আস্বাদন করা যায়। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের যুগ-বিবর্তনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। পদাবলি সাহিত্যের চণ্ডীদাস অনাড়ম্বর ভাষার কবি, বাহুল্যবর্জিত অকৃত্রিম সরলতায় তিনি প্রকাশ করেছেন নিতান্ত মানবিক অনুভব। বিদ্যাপতির পদগুলো সম্পর্কে বলতে হয়, তাঁর রাধাকৃষ্ণাশ্রিত পদাবলি কোনো বিশিষ্ট ধর্মচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, বরং লৌকিক প্রেমচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার অলংকারশাস্ত্র-সম্মত শৃঙ্গাররসের কবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া সমালোচকের মতে, 'জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র—এই তিন জনই রাজসভার প্রশ্রয় পরিপুষ্ট ক্ষয়িষ্ণু নাগরিক সভ্যতার কবি। তিনজনের কাব্যরুচি ও জীবন প্রত্যয়ের মধ্যে তাই উল্লেখযোগ্য সাধর্ম্য আছে (কৌশিক ২০১৯: ৫৪)। পদাবলির গুণ ও মান বৃদ্ধিতে ষোলো শতকের কবি জ্ঞানদাসেরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আধুনিক কালের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য তাঁর পদে লক্ষ করা যায়। চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় গোবিন্দাস কবিরাজকে। ছন্দ-অলংকার ও ধ্বনিমাধুর্যে গোবিন্দদাসের পদ বিদ্যাপতির সমতুল। বাঙালি জীবনে বৈষ্ণব পদাবলির অবস্থান সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> জীবনানুগ সাহিত্যে মানুষের অধ্যাত্মচেতনা কীভাবে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করতে পারে, তার অবিস্মরণীয়তার দৃষ্টান্ত বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী। ... পরম্পরাগত ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাম্প্রদায়িক গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালির অনুভূতির মর্মমূলে সঞ্চারিত হয়েছে কোমলকান্ত পদাবলীর রসলালিত্য এবং আত্মভাবলীন গীতিকাব্যধর্মী মন্ময়তা। (কৌশিক ২০১৯: ১)

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে গীত অর্থে 'পদ' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'স্বরতালপদাশ্রয়ম্', 'স্বরতালপদাত্মকম্' প্রভৃতি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে গানের অবয়বগত বৈশিষ্ট্য বোঝাতে 'পদ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব থেকে শুরু করে সতেরো শতক পর্যন্ত পদাবলি সাহিত্যের ধারা অব্যাহত। জয়দেবের মাধ্যম ছিল কেবল সংস্কৃত ভাষা, পরবর্তী সময়ে পদকর্তাদের সংস্কৃত, মৈথিলি, ব্রজবুলি এবং বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়। আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অনন্য মূল্যায়ন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১.১

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-সাহিত্য খুব বিস্তৃত না হলেও সাহিত্যবিষয়ক জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার পথ নির্মাণ করেন তিনিই। তাঁর সমালোচনাকর্মকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব, যার প্রধান ধারা হলো তুলনামূলক সাহিত্যবিচার। তাঁর উল্লেখযোগ্য সব সমালোচনাই *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২৭৯ জৈষ্ঠ ১৮৭২) 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলো হলো:

'উত্তরচরিত', 'গীতিকবিতা', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা', 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সমালোচনা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'। শেষোক্ত প্রবন্ধ দুটি সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা এবং মূলত জীবনীভিত্তিক সমালোচনা। সমালোচনা জাতীয় রচনার মধ্যে *ক্যালকাটা রিভিউ* পত্রিকায় প্রকাশিত 'Bengali Literature' (১৮৭১) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ এবং *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৯২) গ্রন্থ বিশেষ ধরনের রচনা। বিশেষত কৃষ্ণচরিত্র ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থ নয়। 'কিন্তু সাহিত্যের যে-ধরনের তথ্যাশ্রিত ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা আজকাল সুদূর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয় মহলে সুসমাদৃত, সেই জাতের সাহিত্য-সমালোচনা "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে নিতান্ত কম নেই। মনে রাখতে হবে, যিনি যুগপৎ ইতিহাস গবেষক এবং দক্ষ সাহিত্যসমালোচক, এমন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষেই "কৃষ্ণচরিত্রে"র মতো গ্রন্থরচনা সম্ভব ছিল না।' (সত্যেন্দ্রনাথ ২০০৩: ৮৫)

বঙ্কিমকৃত সমালোচনায় মধ্যযুগের গীতিকবিতা প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে মূলত দুটি প্রবন্ধে—'গীতিকাব্য' এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। এছাড়া 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে বিদ্যাপতিসহ বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের কাব্যকে 'গীতিকাব্য' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ ক্ষেত্রে গীতিকাব্যের সংজ্ঞার্থও নির্ধারণ করেছেন তিনি:

> গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইলে লাগিল।
>
> অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফূটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য। (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৩)

গীতিকাব্যকে অব্যক্তব্য ভাব-অনুভূতির উপযুক্ত আধারও মনে করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরেজি 'Lyric' শব্দটি এসেছে গ্রিক 'lyre' থেকে যা আসলে বাদ্যযন্ত্রের সমার্থক। প্রাচীন গ্রিসে 'লাইয়ার' নামক বাদ্যযন্ত্র সহকারে সংগীতসম এক ধরনের পরিবেশনাকেই বলা হতো 'lyre'। সাহিত্য-আঙ্গিক হিসেবে গীতিকবিতার পূর্ণ বিকাশ উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিদের রচনার মধ্য দিয়েই ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে হিব্রু কবিরা এক প্রকার ভক্তিমূলক সংগীত (Psalm) রচনা করেছেন। প্রাচীন 'জিউশ' ধর্মাবলম্বী কবিদের এই গীত-রচনাসমূহ হিব্রু বাইবেলে সংকলিত হতে দেখা যায়। জাপানি হাইকু কবিতার মধ্যেও রয়েছে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কালে ইংরেজ রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) প্রদত্ত সংজ্ঞার্থটিই গীতিকবিতার প্রধান গুণ নির্ণয় করেছে। *Lyrical Ballads* গ্রন্থের (১৮০০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ) ভূমিকায় উত্তম কবিতার সংজ্ঞার্থে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন—

> Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility. (Wordsworth 2007: Preface)

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে, কবি হবেন এমন একজন মানুষ, যিনি মানবচরিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং যিনি তার আপন আবেগ ও ইচ্ছা প্রকাশে স্বচ্ছন্দ ও আনন্দিত থাকবেন; তাঁর সে শিল্প-আনন্দ ব্যক্তিআবেগ থেকে সর্বজনীন অনুভবে পরিণত হবে।[১]

কবিসত্তার অন্তর-অনুভূতি কিংবা ব্যক্তিনিষ্ঠ আবেগ-অভিজ্ঞতা তথা মন্ময়তাই গীতিকবিতার প্রধান গুণ। অর্থাৎ সে যেন অনেকটা কবিরই স্বগতোক্তি। গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে বঙ্কিমচন্দ্র বক্তার ভাবোচ্ছ্বস পরিস্ফুট হওয়ার দিকটি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নাটক, মহাকাব্য ইত্যাদির সঙ্গে গীতিকবিতার পার্থক্যও নির্ণয় করেছেন। গীতিকবিতার 'সাবজেক্টিভিটি' গুণই এর প্রধান গুণ, বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কার্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য' (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৪)। বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন:

> বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জুরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনাকাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৩)

উল্লেখ্য যে, 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র যখন রচনা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য প্রকাশিত হয়নি। বৈষ্ণব কবিতাকে আধুনিক গীতিকবিতার সাথে তুলনা করা যায় কি না সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। গান হিসেবেই মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা লিখিত হয়েছিল। এছাড়া এসব কবিতায় বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কবিরা তাদের বিশিষ্ট সাধনাতত্ত্বের বাণীও প্রকাশ করেছেন। আধুনিক গীতিকবিতা মূলত ব্যক্তিগত ভাব-অনুভূতির প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত এবং গীতিরসপূর্ণ কবিতা। উভয়ের পার্থক্য সূচনায় সমালোচক বলেন:

> আধুনিক গীতিকবিতায় বিশ্বচেতনা কবির আত্মচেতনায় মানবরসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবি মূলত দ্বৈতবাণী বলিয়া তাহার জগৎদর্শন রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত, আধুনিক গীতিকবির জগৎদর্শন কোন রূপকের মধ্য ধরা দেয় নাই। বৈষ্ণব কবিতার একমাত্র বিষয়বস্তু প্রেম, আধুনিক গীতিকবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্র জীবনানুভূতি। (শ্রীশচন্দ্র ১৯৯৭: ৪৯)

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য বৈষ্ণব কবিতাকে উৎকৃষ্ট শ্রেণির গীতিকাব্যই মনে করেছেন। হৃদয়ের ভাব তথা বিচিত্র ভাব-কল্পনা প্রকাশে ও সুরসঙ্গতি প্রতিষ্ঠায় গীতিকবির যে সামর্থ্য, তা 'অবজেকটিভ' গুণসমৃদ্ধ শিল্প-আঙ্গিক থেকে পৃথক। আর এই গুণটিকে বঙ্কিমচন্দ্র অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এও মনে করেন যে, বাক্যই শিল্পের সহায়; কিন্তু যা 'অব্যক্তব্য', তাতেই 'গীতিকাব্যকারের অধিকার', এবং তা উৎকৃষ্ট শিল্পেরও একটি মহৎ গুণ (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৩)। বাল্মিকীর *রামায়ণের* সাথে ভবভূতির *রামায়ণের* তুলনা প্রসঙ্গে সীতার অপবাদের কথা শোনার পর রামের আচরণ ও অভিব্যক্তির বর্ণনায় বাল্মিকীর রামের অবিচলিত, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং নীরব শোকপ্রবণ প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করেছেন বঙ্কিম। যেখানে ভবভূতির *উত্তরচরিত* গ্রন্থে রামের অসংবরণীয় হৃদয়োচ্ছ্বাস পরিণত হয়েছিল বাগাড়ম্বরে, যা

করুণরসকে বিঘ্নিত করেছে বলে মনে করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে শেক্সপিয়রের ওথেলোর দুঃখানুভূতি প্রকাশের শিল্প-মাহাত্ম্যও বর্ণনা করেন তিনি। সুতরাং মূর্ততাই অনুভূতির প্রগাঢ়তা প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অব্যক্ত থেকেও ভাবসমৃদ্ধ সৃজনের প্রবর্তনা ও ব্যঞ্জনা কেবল গীতিকবিতার জন্যই নয়, সত্য সব শিল্পরূপের জন্যও—বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে এই ভাবও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নেই—এই মত ব্যক্ত করে বঙ্কিম বলেন, 'একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ' (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৬)। সন্দেহ নেই, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার প্রধান ফসল এই বৈষ্ণব পদাবলি। প্রাক্-আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আলোচনায় পদাবলি সাহিত্যের উদ্ভব সম্পর্কে সমালোচক বলেন:

> কোমল, ভাবরসসিক্ত, অনুভূতির গভীরতায় অবতরণশীল মন এবং এই ভাবতন্ময়তা-উপযোগী অমৃতনিঃস্যন্দী, সৌন্দর্য-পরিমণ্ডলরচনা-নিপুণ ভাষা—এই দুয়ের সংযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই উচ্চ কোটির বৈষ্ণব গীতিকবিতা সৃষ্টি হইয়াছিল। (অরুণকুমার ১৯৯৭: ২০)

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের শুরুতেই 'সাহিত্যকে নিয়মের ফল' বলে চিহ্নিত করে পদাবলি সাহিত্যের প্রসিদ্ধির কার্যকারণ নির্ণয় করেছেন:

> বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। ... সাহিত্য দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। ... সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৭)

সাহিত্যকর্মের ওপর দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবের প্রকৃতি নিরূপণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাস, সমাজ ও জীবনধারার প্রভাবে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, রূপ ও রীতির পরিবর্তন হয়; ফলে সময়ের প্রতিবিম্ব হিসেবে সাহিত্যকর্মের বিচারও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে ফরাসি সমালোচক ও দার্শনিক হিপোলাইত এডল্ফ তেইনের (১৮২৮-১৮৯৩) ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে এ ধরনের সমালোচনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমকালে তেইনের মতো অনেক সমালোচকই সাহিত্যের বস্তুভিত্তিক ঐতিহাসিকতায় গভীরভাবে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সমাজগত কার্যকারণে—মূলত বস্তুগত কার্যকারণে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল। বিখ্যাত ফরাসি সমালোচক তেইনের পরিবেশতত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমতের সুগভীর মিলের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন' (সত্যেন্দ্রনাথ ২০০৬: ৮৬)। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে হেনরি থমাস বাক্‌লে (১৮২১-১৮৬২) এবং জার্মান ভাষাবিদ ম্যাক্সমুলারের (১৮২৩-১৯০০) উল্লেখ করেছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে প্রকাশিত বাক্‌লের *History of civilization in England* (১৮৫৭) গ্রন্থটি সমকালে একটি প্রভাববিস্তারী রচনা। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে এতে। ভারতীয় দর্শন-তত্ত্ব ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে ম্যাক্সমুলারের *The six system of Indian Philosophy* (১৮৯৯) গ্রন্থটির উল্লেখ করলেও বঙ্কিম স্বীকার করেছেন যে, এর সাথে প্রকৃত

সাহিত্যের সম্পর্ক সামান্যই। এখানে 'প্রকৃত সাহিত্য' বলতে ভারতবর্ষের অনার্য সাহিত্যকেই বুঝিয়েছেন তিনি। সাহিত্য-সমালোচনা করতে গিয়ে সমাজতত্ত্বীয় গবেষণায় সাথে কোনো সাহিত্যকর্মের পরিপ্রেক্ষিতকে সম্পর্কিত করা কিংবা সময়-সমাজ-সংস্কৃতির রূপরেখা বিষয়ক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই উক্ত দুই গ্রন্থকারের উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থটি আলোচ্য। *কৃষ্ণচরিত্র*কে সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থ বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও একে ঐতিহাসিক গবেষণা বা ইতিহাস-সমালোচনা হিসেবেই দেখেছেন। উল্লেখ্য যে, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থে 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধও ছিল যা *বঙ্গদর্শন* (১২৮১ চৈত্র সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে গভীর ও ব্যাপক গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে বহুবার স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে সুকুমার সেন লেখেন: 'ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ... কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম যে মননশীলতার এবং শাস্ত্রকে বিচারের কষ্টিতে যাচাই করিবার মতো স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তখনকার পক্ষে অত্যন্ত অসাধারণ' (সুকুমার ১৩৫০: ১৯৬)। *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ *কৃষ্ণচরিত্রে*র সমালোচনায় লিখেছেন:

> যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্পসহকারে "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬০৪/৫)

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সমাজবীক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি একজন দক্ষ ইতিহাস গবেষকের। তবে তিনি নিষ্ঠ সাহিত্যসমালোচকও বটে। ফরাসি সমালোচক তেইন সাহিত্য বিচারে যে তিনটি কেন্দ্রীয় সূত্রের (race, miliu, moment) অবতারণা করেন, তাতে একজন লেখককে বাহ্য সত্য দ্বারা প্রভাবিত এবং তাকে সমকাল-সমাজ-সংস্কৃতিগত পরিমণ্ডলের অংশীদার হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও জাতীয়তা-সাময়িকতাকে সাহিত্য-বৈচিত্র্যের কারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন; তেইনের সাথে তাঁর পার্থক্য হলো তিনি সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার সাথে স্রষ্টার আত্মস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের কথাও সমান জোর দিয়ে বলেছেন। যেমন, বিভিন্ন কৃষ্ণচরিত্রের প্রভেদ ও এর ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন:

> প্রথমে বক্তব্য প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা বিবেচনা করা অকর্তব্য। কাব্যে কাজে প্রভেদ নানা প্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন, সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ... অতএব, কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং স্বাতন্ত্র্য। যতি চারিজন কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা। (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ১৯৮৭)

এছাড়া 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে তিনি বলেন: 'ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে' (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫৩৬)। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে সর্বতোভাবে বাইরের নিয়ন্ত্রণের অধীন মনে করেননি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য স্মর্তব্য:

> বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে ঐতিহাসিকতা গোঁড়া জড়বাদীর ঐতিহাসিকতা নয়, সে বস্তুবাদ যান্ত্রিক বস্তুবাদ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করেন যে সাহিত্য নিয়মের ফল। কিন্তু সে নিয়ম যথেষ্ট বিস্তৃত, যথেষ্ট উদার, তার মধ্যে শিল্পীর আত্মস্বভাবের স্বাধীনতার অবকাশ আছে।
>
> ... খাঁটি জড়বাদীরা শিল্পীর আত্মস্বভাবের অধিকারকে মানেন না, খাঁটি লীলাবাদীরা দেশকালের অধিকারকে, ইতিহাসের অধিকারকে স্বীকার করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের অধিকারকেই স্বীকার করেন। (সত্যেন্দ্রনাথ ২০০৩: ৮৬-৮৭)

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগের গীতিকবিতার উদ্ভব ও বিকাশের সূত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এবং এর ঐতিহাসিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ সূত্রে রামায়ণ ও মহাভারতকে ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রের প্রতিফল হিসেবে বিবেচনা করেছেন তিনি। রামায়ণকার নিজেও তাঁর রচনাকে 'সংহিতা', 'আখ্যান', 'পুরাবৃত্ত', 'ইতিহাস', 'কাব্য' বলেছেন। রচনাশৈলী ও কাহিনির বিচারে রামায়ণ হলো কাব্য, মহাভারত ইতিহাস-পুরাণ। ভারতবংশের সামগ্রিক ইতিহাসের মহৎ কাহিনি অথবা ভারতযুদ্ধের বর্ণনা মহাভারত নামে পরিচিত।[২] সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি কালিদাস বহন করেছেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক সুবর্ণযুগ। 'ধর্মানুচারিণী সাহিত্যে'র পাশাপাশি জীবন তৃষ্ণাপূর্ণ এবং বিলাসী আকাঙ্ক্ষা সমৃদ্ধ সৃষ্টি হলো 'কালিদাসের কাব্য নাটকাদি' বলে মত প্রকাশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। রামায়ণ-মহাভারতসহ অন্য পুরাণ কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমরূপান্তরিত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে প্রাচীন বাঙালি চরিত্র্যের স্বরূপ বর্ণনায় তিনি লেখেন:

> ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। ... সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্র্যের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৮)

আর্য ও অনার্য-প্রকৃতির পর্যালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বা সাহিত্যিক নৃতত্ত্ব পাঠে সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ এবং যুগ ও অঞ্চলভেদে সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। বিশেষত সাহিত্যিক নৃতত্ত্ব ঐতিহাসিক কাল, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূল্যায়নে সচেষ্ট থাকে। সাহিত্যরূপের বৈচিত্র্যের পেছনে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের রূপ এবং বিবর্তনকে দায়ী করে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যের যে বিশ্লেষণ

করেছেন, তা অনেকটা সাহিত্যিক নৃতত্ত্বীয় (Literary Anthropology) ব্যাখ্যার মতোই। সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র—এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পরিচয়-পর্বে গীতিকাব্যের উদ্ভব, বিকাশ ও দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের সৃষ্টিকর্মের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বাংলা ও বাঙালির আবহাওয়া, ভূমির গঠন, খাদ্যরুচি, সংস্কৃতি ও মানসগঠনকে কার্যকারণ হিসেবে বিবৃত করেছেন। বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন বঙ্কিম। প্রথম দুই শ্রেণিতে মধ্যযুগের গীতিকাব্যকার; পরে আধুনিক বাঙালি গীতিকাব্য লেখকদের তৃতীয় শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। বহিঃপ্রকৃতি-প্রধান ও অন্তঃপ্রকৃতি-প্রধান—এ দুই গোত্রের কাব্যই 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জয়দেবের রচনায় বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতিতে অন্তঃপ্রকৃতির। অন্যান্য গীতিকবি কিংবা জয়দেবের সাথে বিদ্যাপতির কবিপ্রকৃতির পার্থক্য সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন:

> এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপতি দৃষ্টি করেন; ... বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৮)

জয়দেব কিংবা বিদ্যাপতি দুজনেই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা রচনা করেছেন। অথচ বহিরিন্দ্রিয় অনুগামী জয়দেবকে গীতিকবিতার সার্থক কবি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র। যদিও জয়দেবের 'মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি'র মাধুর্যকে তিনি প্রশংসা করেছেন, তবুও তাঁর কাব্যে বহিরিন্দ্রিয়ের আনুগত্যকে তিনি নিন্দনীয় মনে করেছেন। তৎকালীন সমাজের চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়পরতার প্রতিফলন তিনি জয়দেবের রচনায় দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে জয়দেবের সাথে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের তুলনাও করেছেন বঙ্কিম। তাঁর মতে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা আধ্যাত্মিকতা-প্রধান। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সাযুজ্যময় শিল্পরচনাই কাম্য সমালোচকের। এর ব্যতিক্রমে কাব্যে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা ও অন্য দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ ঘটে।

প্রাক-চৈতন্য পর্বে বিদ্যাপতিই দেশ-কাল অনুযায়ী যতটা সম্ভব ভাবাবেগসমৃদ্ধ গীতিধারার সৃষ্টি করেন। অন্তঃপ্রকৃতির কবি হিসেবে বিদ্যাপতি ছাড়াও গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সমালোচক। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, সার্থক কবিতায় অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দুই-ই সমভাবে রূপায়িত হয়:

> কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতির ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। ... যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত বিচিত্র

> করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৯)

অর্থাৎ বাহ্যশোভাসমৃদ্ধ (ornate) নয় বরং গূঢ়ার্থ সংবলিত ব্যঞ্জনাময় (connotative) রচনাই শিল্পীর লক্ষ্য। বিশেষত বিশুদ্ধ গীতিকবিতায় মুক্ত গীতিপ্রাণতা, কবিহৃদয়ের তীব্রতা ও রসানুভূতি সঞ্চারের প্রক্রিয়া হবে সংহত, প্রকাশের গাঢ়তা ও ব্যঞ্জনধর্মিতায় শ্রেষ্ঠ—বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে এই ভাবই প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক বাঙালি গীতিকাব্য লেখকদের বঙ্কিম তৃতীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বঙ্কিমের মতে, এঁরা আধুনিক ইংরেজ গীতিকবিদের অনুগামী। এঁদের সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করে তিনি লেখেন, 'এঁরা জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু, তাহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। ... তাঁহাদের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে ... কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে' (বঙ্কিমচন্দ্র ২০০৬: ৫১৮)। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও আধুনিক বাঙালি গীতিকবিদের, যেমন মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বঙ্কিম। তাঁর মতে, বিদ্যাপতির কবিতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়। অন্য দিকে, মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব বিদ্যাপতির মতো এতটা প্রগাঢ় নয়।

কাব্যে অন্তর্মুখিতা ও বর্হিমুখিতার সম্পর্ক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য স্পষ্ট। তবে তাঁর কালের ইংরেজি শিক্ষিত 'আধুনিক' বাঙালি কবিদের যে তিনি তৃতীয় গোত্রে ফেলেছেন সেখানে 'এই তথাকথিত তৃতীয় গোত্রের কবিদের কোনো মৌল বিশিষ্টতা, কোনো স্থায়ী অথচ স্বতন্ত্র চরিত্র-লক্ষণ কিছু দেখাতে পারেননি' (সত্যেন্দ্রনাথ ২০০৩: ১০০)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বিস্তৃতির ফলে আধুনিক বাঙালি কবিদের প্রগাঢ়তার অভাব ঘটেছে। যদিও প্রগাঢ়তার অভাব বিস্তৃতি ছাড়াও আরো অনেক কারণে ঘটতে পারে। আধুনিক বাঙালি গীতিকবি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত কিছুটা অযৌক্তিক; এর কারণ, তাঁর সামনে ছিলেন মধুসূদন আর হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র। পরিণত রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তার সাথে তিনি তখনও পরিচিত হননি।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' কিংবা 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার ধরন সৃজনশীল ও রোমান্টিক ঘরানার। প্রকৃতিগতভাবে এটি তুলনামূলক সমালোচনা। এ প্রবন্ধের গুরুত্ব এই যে, কাব্যবিচারে সমালোচক নন্দনতাত্ত্বিক অভিমত এতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া গীতিকবিতা হিসেবে মধ্যযুগের কাব্য বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থকতা কেবল সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিরূপণে নয়, বরং শিল্পীসুলভ অর্ন্তদৃষ্টিতে গীতিকবিদের কাব্যনির্মাণ-কৌশলের মূল্যায়নও কৃতিত্বের সঙ্গে করেছেন তিনি—যা একইসাথে রসসিদ্ধ ও জ্ঞানপন্থী সমালোচনার পরিচয় দেয়।

১.২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বৈষ্ণব পদাবলির যোগ গভীর। তাঁর রচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়ে সমালোচকের মাঝে মতদ্বৈততা খুব একটা

নেই। পদাবলি সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধে। অধিকাংশ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতিকে। বিশেষত বিদ্যাপতির পদাবলির ছন্দ ও ভাষা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ ঘটে বৈষ্ণব সাহিত্যে। ব্রজবুলি ভাষার সৌন্দর্য বৈষ্ণব কবিতার অনুশীলনে তাঁর উৎসাহ বাড়িয়েছিল। 'অপরিচিত ভাষার আবেগ ও অর্ধপরিচিত ছন্দের তাল বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে সাহিত্যরসের পিপাসু করে তুলেছিল' (সুকুমার ১৩৯৩: ১৪)। জয়দেবের *শ্রীগীতগোবিন্দম্* পাঠের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

> আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে 'নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং' এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝঙ্কারের মুখে 'নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং' ওই এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৪৬৫/৯)

১৮৮১ সালের পরপরই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯০৮) সংস্পর্শে এলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলি ও চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি ভালো করে পড়লেন এবং পদাবলি রসে মগ্ন হলেন। 'তিনি এখন উপলব্ধি করলেন যে বৈষ্ণব পদাবলির মধ্য দিয়েই ভারতীয় সাহিত্য পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধারা বাহিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন তাঁরই অগ্রজ' (সুকুমার ১৩৯৩: ২৬)। ১২৮৮ সালের *ভারতী* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় সারদাচরণ ও অক্ষয় সরকার সম্পাদিত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ*র প্রথম খণ্ড *বিদ্যাপতির পদাবলি* সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। *ভারতী* পত্রিকায় এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ/(বিদ্যাপতি)'—যেখানে সম্পাদনা-রীতি ও অর্থ-ব্যাখ্যার অনেক ত্রুটি দেখিয়ে দেন তিনি। বৈষ্ণব পদাবলি ও পদকর্তা বিষয়ে এটা ছিল সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্র-কালসীমায় বিদ্যাপতির কাব্যরসে মগ্ন হয়েছিলেন অনেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার কিংবা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এঁদের থেকে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি-প্রেম বা মুগ্ধতা বেশি লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, নাটক কিংবা উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় ভাব-ভাবনার প্রভাব লক্ষণীয়। রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, বাঁশি, মথুরা ইত্যাদি তাঁর কাব্য-ভাবনাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম বসু, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, বিমানবিহারী মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পম্পা মজুমদার প্রমুখ নানাভাবে আলোচনা করেছেন।

ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের *ভানুসিংহের পদাবলী*র প্রথম কবিতার মধ্যেই। এ সম্পর্কে সমালোচক-মত: 'বৈষ্ণব কবিতার ভাষা-মাধুর্য, ছন্দ-লালিত্য, তাহার

লোকোত্তর মহিমা তরুণ কবির হৃদয় মথিত করিয়াছিল। তাহারই ফলে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" রচিত হইয়াছিল' (অজয় কুমার ১৯৫৯: ১৬২)। বৈষ্ণব গীতিকবির সমালোচনায় পদাবলির ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দ কিংবা রূপকল্পনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' শিরোনামে *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব* পত্রিকায় ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে গীতিকাব্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি সমকালেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে:

> গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প ... নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না।' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১৪৭-১৪৮/১৭)

এ প্রবন্ধে ইংরেজি 'Lyric Poetry'র প্রকার odes, sonnets-এর সমষ্টিকে বাংলায় গীতিকাব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গীতিকাব্য বাঙালির হৃদয় থেকে উত্থিত বলে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মনে করেন: 'এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়েছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙালির নির্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১৪৭/১৭)। মধ্যযুগের গীতিকবিতা সৃজনের পেছনেও রয়েছে বাঙালির কোমল হৃদয়, যে হৃদয়ে প্রেম বিস্তার লাভ করেছে আষ্টেপৃষ্ঠে: 'এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশে প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আর্বিভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১৪৮/১৭)। তবে কেবল বঙ্গদেশের কোমল প্রকৃতি ও কবিমানস নয়, গীতিকবিতা রচনার তাগিদ বা প্রয়োজনটি যুগমানসের রূপান্তরের সাথেও সম্পর্কিত। 'কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন' নামক প্রবন্ধে গীতিকবিতা উদ্ভবের কার্যকারণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> যখন জটিল লীলাময় গাঢ় বিচিত্র বেগবান মনোবৃত্তিসকল সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত, ঘটনাবৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৫/১৫)

গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্পর্কিত একটি উৎকৃষ্ট তুলনামূলক সমালোচনা 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি'[৩] প্রবন্ধটি *ভারতী* পত্রিকার ১২৮৮ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের সাথে এর তুলনা করে বলা যায়, দুজনের সমালোচনা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এতে মধ্যযুগের গীতিকাব্যে বিধৃত প্রেম ও বিরহের স্বরূপও বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনায় জয়দেবের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনায় বিদ্যাপতির শিল্পস্বভাব ভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে। বর্ণনার সহজতাকে কবির অন্যতম প্রধান গুণ বলে চিহ্নিত করেছেন

রবীন্দ্রনাথ, যা আসলে গীতিকবিতারও একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে অভিব্যক্তির সহজতা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন:

> নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। ... সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৭/১৫)

কবির আত্মস্ফূর্ত হৃদয়বৃত্তির স্বতঃউৎসারণ যখন সকল প্রাণের ভেতর প্রবেশ করে, তখনই তা হয়ে ওঠে সহজ, কিন্তু প্রকাশের এই প্রক্রিয়া সহজ নয় বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ 'সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৭/১৫)। যাঁরা যথার্থ কবি, তাঁরা সকলেই অন্তর্মুখী, হৃদয়ের ভাবের আবেগে মগ্ন। এই সূত্রে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের চোখে চণ্ডীদাস হয়ে ওঠেন 'সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৭/১৫)। চণ্ডীদাস ছাড়াও সহজ সরল ভাষায় বৈষ্ণবীয় গীতিকবিতা লিখেছেন কবি রায় বসন্ত, যিনি আনুমানিক ৮৪০ বঙ্গাব্দের কবি। 'বসন্তরায়' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উক্ত কবির কবিতার ভাব ও ভাষার বিচারে বলেছেন যে তা 'সরল প্রাণের সরল কথা' এবং তাতে উপমার ঘনঘটা নেই (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১০৫/১৫)। অর্থাৎ দুই বৈষ্ণব কবির রচনায় সহজতা গুণই আকৃষ্ট করেছে সমালোচককে। মূর্ত ও ব্যক্ত ভাবকে বর্ণনার অতিক্রমী করে তোলাও কবির মহৎ শিল্পকৌশল বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। সুখ-দুঃখময় সংবেদনকে শব্দের অবয়বে অভিব্যক্ত করা সবসময় সহজ নয়। কবিত্বের অনুভবে রূপের মধ্যে আরো গভীরের দেখা, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'অধিক-দেখা', যা তিল তিল করে বর্ণনা করলেও তা ব্যক্ত হয় না, তখন 'বর্ণনা বন্ধ করিয়া কেবল ভাবগুলি মাত্র ব্যক্ত করিতে হয়।' যেমন—'শ্যামের ভাব-রূপেতে হাসিতে গানেতে জড়িত একটি ভাব, পৃথক পৃথক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত একটি ভাব নহে। রাধা যে বলিয়াছেন "হেরইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ", ঐ কথাটি সত্য—নহিলে "ভুরু বাঁকা" বা "চোখ টানা" বা "নাক সোজা" ও-সব কথা কোনো কাজের কথাই নয়' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১০৭/১৫)। বৈষ্ণব পদাবলির ভাব-বর্ণনার বিচারে কবিকৃতির আলোচনায় সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নন্দনতত্ত্বও প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাপতি ও বসন্তরায় রচিত পদের তুলনায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবকে মূর্ত করে তোলার ক্ষেত্রে দুই কবির রূপবোধ ও বর্ণনার ভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলসূত্র হলো অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব; আর এই সঙ্গেই গড়ে ওঠেছে বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের অপরূপ বাণীব্যঞ্জনা। এই প্রেমতত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে বিরহ-বেদনার ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপ। চৈতন্যপূর্ব যুগের যে বৈষ্ণব কবির রচনায় অনির্বচনীয় উপলব্ধির অতল গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে, তিনি হলেন চণ্ডীদাস। প্রেমের গভীরতম রহস্য উন্মোচনে তিনি সিদ্ধ মরমী কবি। তাঁর অনাড়ম্বর ভাষাভঙ্গিতে অনাবৃত প্রাণের নিরাভরণ আনন্দ-বেদনার রূপ সার্থক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় চণ্ডীদাসের প্রেমবোধ, ভাব প্রকাশের কৌশল তথা ভাষার সৌন্দর্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, চণ্ডীদাস দুঃখের এবং হৃদয়-গভীরতার কবি। 'পিরীতি-নামক যে জ্বালা! পিরীতি-নামক যে দুঃখ, এই দুঃখেই

চণ্ডিদাসের প্রেমময়তার রূপ প্রকাশিত, কারণ মিলনেও সে দুঃখ ঘোচে না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৯/১৫)। চণ্ডীদাসের রাধার উক্তি:

বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ
চণ্ডীদাস কয়, এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!

চণ্ডীদাসের পদাবলিতে পূর্বরাগ থেকে আত্মনিবেদন পর্যন্ত সর্বত্রই এই দুঃখবোধের আর্তিকরুণ সজল মাধুর্য ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ সেইসব বেদনানিষিক্ত আত্মস্বরূপের অনবদ্য বাণীভঙ্গি নির্বাচন করেন, যেখানে কবি-সমালোচকের ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির মন্ময়তা সমর্থিত হয়। চণ্ডীদাসের রাধার সমাহিত প্রেম ও বেদনার শান্ত সংক্ষিপ্ত উচ্চারণও রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। যেমন, বর্ষণমুখর অন্ধকার রাতে কৃষ্ণ রাধার অভিসারে পথে বেরিয়েছিল। কিন্তু, কৃষ্ণের প্রতীক্ষাস্থল কোনো নিভৃত কুঞ্জ নয়, রাধার গৃহের আঙিনা। রাধা শ্যামকে দেখে বলে উঠলেন:

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥ (উদ্ধৃত, রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৮/১৫)

অনুভবের গভীরতায় আস্বাদ্য এই আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই! প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে মুখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। ... শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গভঙ্গ, এই উত্থানপতন কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে!' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৮/১৫)। রবীন্দ্রনাথের রসনিবিড় আস্বাদনে চণ্ডীদাসের এই পদটি নবতর মহিমা লাভ করেছে। রাধার যন্ত্রণাদগ্ধ প্রেম ও আক্ষেপের অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন তিনি, 'যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি' কিংবা 'কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?', 'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমনি হউক যে!'—এই সুপরিচিত পদটির ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> রাধা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। ... ঐ এক "যেমন করিছে" শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতে না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৯/১৫)

প্রেম কিংবা প্রেমের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা, রাধার দ্বিধা-আন্দোলিত সত্তার ব্যথাদীর্ণ ব্যাকুলতা চণ্ডীদাসের পদে যেভাবে ফুটে উঠেছে তার সাথে অন্য বৈষ্ণব কবির তুলনা খুঁজে পান না রবীন্দ্রনাথ। চণ্ডীদাসের প্রেম তাঁর বিবেচনায় বিশুদ্ধ প্রেম: 'প্রেম ও উপভোগ উভয়কে তিনি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন 'কামগন্ধ নাহি তায়' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১০৪/১৫)। ইন্দ্রিয় সম্ভোগের বর্ণনা চণ্ডীদাসের স্বভাব-বিরোধী। দৈহিক মিলনের রতি সুখসার মুহূর্তকে তিনি তাঁর পদে রূপায়িত করেননি। প্রেমের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও অনেকটা বিশুদ্ধতাবাদী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> যে প্রেম বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে দেহের চারিপাশে ঘুরিয়া মরে, ব্যক্তি-মানুষের বাস্তব দেহ-মন যাহার ভিত্তি, সেই আবেগময়, আত্মহারা সাধারণ মানুষের প্রেম, রবীন্দ্রনাথের প্রেম নয়। ... প্রেম অসীম, অনন্তের ধন, আত্মার সম্পদ, দেহের সীমায় তাহাকে ধরা যায় না। দেহসম্বন্ধ বিরহিত, অপার্থিব সৌন্দর্যের নিবিড় অনুভূতি এক অনির্বচনীয় আনন্দরস। (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৭২: ৩৫)

সৌন্দর্য ও প্রেমের বস্তুনিরপেক্ষ এক ভাবময় আদর্শে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রেম-দর্শন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনায় ভিক্টোরীয় আদর্শবাদ রয়েছে। কিংবা বলা যায় তা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চেতনায় স্নাত, কিংবা তাতে রয়েছে রোমান্টিক ভাবালুতা, তবে নিষ্কাম ও ভোগহীন অধ্যাত্ম প্রেমের যে রূপ ভারতীয় দর্শনের, রবীন্দ্রনাথ তারই প্রবক্তা। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের প্রেমবোধের যে স্বরূপ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে বাহ্য জগতের দর্শন-স্পর্শনের স্পৃহা নেই, সেই প্রেম 'স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে।' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১০৪/১৫)।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। তাঁর অতুলনীয় কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রাধাকৃষ্ণ পদাবলি, যা যুগ যুগ ধরে তাঁর জনপ্রিয়তারও কারণ। এ সম্পর্কে সমালোচক বলেন: 'বিদ্যাপতির পদাবলি যে বাঙালির আন্তরনৈকট্য লাভ করেছিল, তার একটি কারণ: বিদ্যাপতির পদাবলি ছিল মধুর রসের; আর বাঙালী রসিকচিত্তের প্রবণতা এই মধুর রসের প্রতিই' (সনাতন ২০০২: ১৫৩)। 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস এবং 'বসন্তরায়' প্রবন্ধে বসন্তরায়ের সাথে তুলনায় বিদ্যাপতির কবিতার বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া এই মৈথিলি কবির সৃষ্ট রাধা চরিত্রের দেহ-মনোগত বিবর্তনের চমৎকার রসমূল্যায়ন 'বিদ্যাপতির রাধিকা' (*সাধনা* চৈত্র ১২৯৮)। বিদ্যাপতির কবিতার 'ভাবের সৌরভ' ও 'গঠনের সৌন্দর্য' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকৃত মূল্যায়ন সমকালেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের সাথে বিদ্যাপতির তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে দুই কবির শিল্প-স্বভাবের বৈপরীত্য চিহ্নিত করেন তিনি:

> বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য

> করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৯৯/১৫)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রেমবোধ ও তার প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য বিষয়ে 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গি, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬০০/৫)। এছাড়া বিদ্যাপতির পদ ছন্দ-সংগীত এবং বিচিত্র রঙে পরিপূর্ণ এবং তাতে রয়েছে যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস: 'বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬০০/৫)। বিদ্যাপতির রাধাও তাই 'নবীনা নবস্ফুটা', যে সদ্য বিকশিত হৃদয়ে অনুভব করছে নিজেরই সৌরভ—

> কবহুঁ রাঁধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
> কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।

রাধার বয়ঃসন্ধির সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস এবং সুগভীর কাব্যানুভূতির বাণীরূপ উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাপতির রাধার নব অনুরাগের লীলাচাঞ্চল্য তাঁর উপমাসমৃদ্ধ ভাষায় এক সৃজনশীল কাব্যিকতা নির্মাণ করে:

> বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে; ফেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি, কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে। বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬০১/৫)

প্রেমোপলব্ধির জগতে রাধার পদার্পণ তথা অনঙ্গের আবির্ভাবে হৃদয়ের যে জাগরণ সূচিত হয়েছে, তাতে রূপমুগ্ধতা ও অসীম সৌন্দর্যতৃষ্ণা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় বিদ্যাপতির রাধার রূপ ও যৌবনের এই চিত্রকে বলেছেন নবীন এবং মধুর। তাছাড়া চণ্ডীদাস 'গভীর এবং ব্যাকুল' এবং 'কঠোর ব্রতসাধনা-স্বরূপে প্রেমসাধনা করা চণ্ডিদাসের ভাব'—যা বিদ্যাপতির সাথে মেলে না (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ১০৪/১৫)। 'বিদ্যাপতিতে সেইজন্য কেবল বসন্ত' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬০১/৫)। রূপবর্ণনা, প্রকৃতি ও হৃদয়ের সৌন্দর্য নির্মাণ প্রভৃতি প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির সাথে বসন্তরায়ের পদাবলিরও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানেও বিদ্যাপতি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ অনুরূপ। বসন্তরায়ের পদে কখনও কখনও বস্তুগত বর্ণনা অতিক্রম করে ভাবের অসীমতা সৃষ্টি হয় বলে মনে করেছেন তিনি, তুলনায় বিদ্যাপতির পদে সেই অন্তর্মুখীনতার বিশুদ্ধতা লক্ষ করা যায় না। বসন্তরায়ের প্রেম প্রশান্ত উদার গম্ভীর, যা বিদ্যাপতির পদে সুলভ নয় বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। তবে 'বসন্তরায়' প্রবন্ধ রচনাকালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি অধিক ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন, যে কারণে বিদ্যাপতির প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। পরিণত বয়সে তাঁর

লেখনীতে বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে মুগ্ধতা দেখা যায়। প্রথম জীবনে যে বিদ্যাপতির কবিতায় ভোগ ও চাঞ্চল্য দেখেছেন, সেই কবিরই বিরহের পদ পরবর্তী সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক মনকে উদ্দীপিত করেছে। 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধে বিদ্যাপতির কবিতার ভাবগত বিস্তার প্রশংসিত হয়েছে। মূলত সুখ কিংবা দুঃখ যে অবস্থার কথা বিদ্যাপতির বর্ণনা করতে যান, তার ব্যাপ্তি বা গভীরতা অনেক বেশি। তাঁর একটি সুবিখ্যাত পদে প্রেমের অনন্ত ভাবরহস্য ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তা উদ্ধৃত করেছেন:

> জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু
> নয়ন না তিরপিত ভেল,
> ... লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
> তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। (উদ্ধৃত, রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬০২/৫)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ-সূত্রে বিদ্যাপতির উক্ত পদটি ব্যবহার করেছেন এবং এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ভাবের গভীরতা, বক্তব্যের সংহতি ও শৈল্পিক উৎকর্ষের কথা বলেছেন। যেমন *সাহিত্য* গ্রন্থভুক্ত 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩৪৪) প্রবন্ধে সৃজনশীল মনে সাহিত্য কীভাবে সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তার আলোচনায় বিদ্যাপতির পদের উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ—ঐ যেমন বিদ্যাপতির—ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর—সেও আমাদের মনের বহু দিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্র মাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কত কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে; যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, অমনি সকলেরই এই অনেকদিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৬৮৯/৪)

তরুণ কবির কাছে বিদ্যাপতির পদাবলির শ্রেষ্ঠ রত্নটি ছিল 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর' ইত্যাদি বর্ষা-বিরহের কবিতা। 'শ্রাবণসন্ধ্যা' (১৩১৭) প্রবন্ধের শেষ অর্ধাংশ জুড়ে শুধুই বিদ্যাপতির 'এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর' পদটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তিকে আশ্রয় করে অখণ্ড দার্শনিক উপলব্ধির বিবরণ রয়েছে। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কেবল অতীত-বর্তমান নয়, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে অতলস্পর্শ বিরহ।' যে প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষিত, সে অনন্তের কেন্দ্রবর্তী এবং অবিনশ্বর; সুতরাং তার সাথে ব্যবধান অনন্তের এবং সে বিরহ চির। 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—মানবমনের এই শাশ্বত বিরহী রূপটি রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত ও অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তা একান্তই তাঁর কবিসত্তার অনুভব বলে প্রতিভাত হয়। কেবল কালিদাসের কাব্যেই নয়, মানবজীবনের গভীরতর সত্য হিসেবে চিরবিরহের এই রূপ-মাহাত্ম্য রবীন্দ্রনাথ অন্বেষণ করেছেন বৈষ্ণবীয় গীতিকবিতায়। 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরহবোধের নিবিড় উপলব্ধি বৈষ্ণবীয় অধ্যাত্মচেতনার সমধর্মী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা কেবল এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, তা 'সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণ ধারা'। বিদ্যাপতির পদ উদ্ধৃত করে নিত্য বিরহের সত্যতা প্রকাশ করেন তিনি:

> বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
> হরি বিনে দিনরাতিয়া।

> বিরহ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত (এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না—কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া)—সেইজন্যে 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। ... এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৫৯৭/৮)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যাত হয়। আত্মগত সাধনা ও তন্ময়তার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব কবিরা জীবনকে নিরীক্ষণ করেছেন। বিদ্যাপতির পদ অবলম্বন করে বিরহবোধের যে দার্শনিক তত্ত্বরূপ উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাতে রয়েছে সময় থেকে সময়ান্তরের নিত্য বর্তমান বিরহ এবং সে বোধ পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত থেকে সর্বজনীনে। বৈষ্ণবীয় কবিতা ও এর ভাব-দর্শনের আলোচনায় এভাবেই অন্তর্ভূত হয়ে ওঠে স্রষ্টা কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সহমর্মিতা ও নব সৃজনের তাড়না।

১.৩

মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ ও নান্দনিকবোধের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সুবিস্তৃত ও সুগভীর সাহিত্যজ্ঞান-সমৃদ্ধ এসব রচনার প্রধান প্রভেদ মূলত সাহিত্যপাঠের আনন্দ প্রকাশ করার ভঙ্গিতে। এক দিকে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ, নৈয়ায়িকের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও পরিমিতি বোধ; অন্য দিকে শিল্পীর প্রকাশক্ষমতার অনুপ্রেরণায় সমালোচনার একান্ত নিজস্ব পথ নির্মাণ—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা তাই বিপরীতমুখীই বলা চলে। বৈষ্ণব পদাবলির মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের জগৎ-জীবনতত্ত্ব তথা সাহিত্যচিন্তার প্রভাব নিবিড়ভাবে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সমালোচনায় সাহিত্যতাত্ত্বিক বা নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাসূত্রের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু 'বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমত এবং প্রধানত সমালোচক এবং সেই সমালোচনার প্রয়োজনেই তিনি সাহিত্যতাত্ত্বিক' (সত্যেন্দ্রনাথ ২০০৩: ১২৫)। অপর পক্ষে, মৌলিক সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর রসোপলব্ধি, পূর্ণতর জীবনবোধ, সেই সঙ্গে আবেগময় কবিত্বমণ্ডিত ভাষা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলিকে রবীন্দ্রনাথ মূলত গ্রহণ করেছেন আত্মপ্রকাশ তথা মানব-প্রকাশের ভাষা হিসেবে। ফলে পদাবলির ধর্মতত্ত্ব নয়, বরং বৈষ্ণব পদাবলিকে মর্ত্য প্রেমানুভূতির অতি সূক্ষ্ম প্রকাশরূপে বিচার করেছিলেন তিনি। 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় কবি লেখেন:

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।
> পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
> অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
> বৃন্দাবনগাথা—এই প্রণয় স্বপন
> শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,

> চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
> শরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার! (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৪১/২)

পদাবলির ভাব-ভাষায় বাঙালির একান্ত সুপরিচিত ঐতিহ্যের অনুরণনও দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সংহতিপূর্ণ বাঙালির বৈষ্ণব-ভাবনা। মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে বৈষ্ণবচেতনা এমন একটা মাত্রা লাভ করেছিল, যে 'চেতনার ঋদ্ধি বাংলার সমাজকে দিয়েছিল নব জীবনের আশ্বাস—মানবিকতার পূর্ণ মহিমা' (সুবোধ ১৪১৫: নিবেদন)। 'সংগীতের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে চৈতন্যের আবির্ভাবের গুরুত্ব ও শাস্ত্র-অতিক্রমী মানবদর্শনের বিকাশ; সর্বোপরি পদাবলি সাহিত্যের সাংগীতিক ব্যঞ্জনা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল, সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগ আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। ... বাঁধন ভাঙিল—সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। ... বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোম্যান্টিক মুভমেন্ট বলে। ... তখন সংগীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগ-রাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬: ৫২১/১৬)

সুতরাং প্রাণময় সহজ অভিব্যক্তির সৃষ্টিজগত হিসেবেই বৈষ্ণব পদাবলির মহিমা ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ; গভীর সহৃদয় সংবেদনায় প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচকের রসসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এসব রচনায়। বৈষ্ণবীয় গীতিকবিতা বিচারে পরবর্তীকালের সমালোচকের বিদগ্ধ দৃষ্টি নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকৃত মূল্যায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

টীকা

১ *Lyrical Ballads* গ্রন্থের ভূমিকায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবি ও কবিতার ভাষা বিষয়ে লেখেন: 'What is a poet? And what language is to be expected from him? He is a man speaking to men ... who has a greater knowledge of human nature, and a more comprehensive soul, than are supposed to be common among mankind, a man pleased with his own passions and volitions.' (Wordsworth 2007: Preface)

২ 'ত্রিভির্বর্ষৈ: সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতধানিদমুত্তমম্॥' (*মহাভারত:* ১/৫৬/৩২, উদ্ধৃত, ধীরেন্দ্রনাথ ১৯৮৮: ৯০)

৩ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে 'চণ্ডিদাস' লেখা আছে। গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য প্রবন্ধে 'চণ্ডীদাস' লিপিবদ্ধ।

সহায়কপঞ্জি

অজয় কুমার চক্রবর্তী (১৯৫৯)। *বৈষ্ণব পদাবলি-সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বনলতা আর্ট প্রিন্টাস।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৭)। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

উপেন্দ্রেনাথ ভট্টাচার্য (১৩৭২)। *রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

কৌশিক কিশোর সর্বাধিকারী (২০১৯)। *বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য: ঐতিহ্য, সাধনা ও উত্তরণ*। কলকাতা: বিগ বুক্স।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২০০৬)। *বঙ্কিম রচনাবলী* ২। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* খণ্ড ২, ৪, ৫, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ১৭। ঢাকা: ঐতিহ্য।

শ্রীশচন্দ্র দাশ (১৯৯৭)। *সাহিত্য সন্দর্শন*। ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০০৩)। *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সনাতন গোস্বামী (২০০২)। *বৈষ্ণব পদাবলি পরিচয়*। কলকাতা: শম্পা বুক হোম।

সুকুমার সেন (১৩৯৩)। *রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সুকুমার সেন (১৪০১)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড, ১৮০১-১৮৮০)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সুবোধ চৌধুরী (১৪১৫)। *বাঙালির বৈষ্ণব-ভাবনা*। কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী।

Wordsworth, Wiliam and Colridge, Samuel Taylor (2007). *Lyrical Ballads* (Edited by Michael Mason). Routledge.